ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 965-972
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.091

প্রমিত বাংলার সংকট ও ঔপনিবেশিক ভাষানীতি: একটি পর্যালোচনা

ইয়াসমিন প্রামানিক, *বাংলা বিভাগ, পান্ডবেশ্বর কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.02.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The debate over the standardized form of the Bengali language has persisted for a long time. In the 19th century, under colonial rule, the accepted form of Bengali prose remained confined to a specific social group. This study examines how colonial language policies, along with the dominance of Sanskrit and English, influenced the shaping of Bengali prose.

During the 19th century, Bengali prose was based on the rigid "Sadhubhasha" style, which was disconnected from the spoken language of the common people. According to Pradyumna Bhattacharya, this division was not merely literary but also reflected social class distinctions. While English prose was being written in a simple and accessible manner, Bengali prose remained rigid and elitist.

By the late 19th century, the conflict between "Sadhubhasha" and "Cholitobhasha" intensified. Rabindranath Tagore and the emerging grammarians of the time emphasized the evolving nature of language and advocated for the necessity of the colloquial form. Tagore believed that the standardized form of a language is not artificially imposed but naturally changes over time. He argued in favor of simplifying Bengali prose and attempted to break the rigid structure of "Sadhubhasha."

Due to colonial language policies, Bengali prose became divided into two streams—formal literary language and the vernacular language of the masses. The development of the printing industry, the popularity of "Bat-tala" publications, and the separation of literary language fueled new debates about standardized Bengali.

Mohitlal Majumdar and Sushil Kumar, De opposed Tagore's views on language. Mohitlal argued that "Sadhubhasha" was the language of Bengali national culture, elevated above rural dialects. On the other hand, Sushil Kumar believed that the strength of the Bengali language stemmed entirely from Sanskrit.

This study concludes that the debate over standardized Bengali is deeply intertwined with the nature of language, colonial rule, social divisions, and literary structures. Although Tagore's linguistic ideas played a crucial role in transforming Bengali prose, the controversy over the true form of the language remains ongoing.

বাংলা ভাষা তার বহুমাত্রিক প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সময় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। বিশেষত প্রমিত বাংলার গঠন ও তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। কলকাতা ও ঢাকার মতো দুটি পৃথক ভাষাকেন্দ্র এবং বহুভাষিক বাস্তবতায় বাংলা ভাষার রূপ নির্ধারণ আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত ও ইংরেজির একচেটিয়া আধিপত্য বাংলা গদ্যকে এক বিশেষ রূপে প্রাতিষ্ঠানিক করেছে, যা পরবর্তী সময়ে প্রমিত বাংলার সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঔপনিবেশিক পরিসরে বাংলা গদ্য ও তার সংকট:

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তার অভিজাতকেন্দ্রিক প্রকৃতি। এটি জনসাধারণের মুখের ভাষার পরিবর্তে কঠোর সাধুরীতির কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েছিল। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের মতে, গদ্য ভাষা সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের প্রতিফলন ছিল। ইংরেজি গদ্য যেখানে সর্বসাধারণের ভাষার কাছাকাছি চলে এসেছিল, বাংলা গদ্য সেখানে নিজেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন:

> "আমি মনে করি, এই বিভাজনকে শুধু সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য সাহিত্যিক গণ্ডির বাইরে গিয়েও অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা গদ্য, ভাষার মতোই একটি সামাজিক উপাদান। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের স্ববিরোধিতাগুলো সেই সময়কার সমাজের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন—গদ্য যখন শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তখনই নবগঠিত নাগরিক ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিয়েছিল।" (Bhattacharya 1975: 223)

ঔপনিবেশিক বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জনসাধারণ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আধুনিক ইংরেজি গদ্যরীতি বিকশিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় ইংরেজি গদ্য সাধারণ মানুষের ভাষার কাছাকাছি চলে আসে। 'পিউরিটান বা প্রোটেস্ট্যান্ট চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক প্রচারক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী এমনকি রয়েল সোসাইটিও শিল্পী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের ভাষাকে গ্রহণ করেছিল' (Bhattacharya 1975: 223-24)। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাংলা গদ্যের ধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি জনমানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তে সাধুরীতির অনড় কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সমাজের গঠন কাঠামোর মধ্যেই বাংলা গদ্যের সংকোচন নীতির কারণ নিহিত ছিল। জাতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠার কোনো সুসংগঠিত প্রয়াস না থাকায়, ভদ্র সমাজের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ভাষাই মান্যরূপ হয়ে উঠেছিল। সমসাময়িক বাংলা ভাষাচর্চার তথাকথিত 'অভদ্র' ধারার কথা বিবেচনা করলে, ঔপনিবেশিক গদ্যের অভিজাত গোষ্ঠী কেন্দ্রিক প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব:

বাংলা গদ্যের ভাষা নিয়ে বিতর্ক প্রধানত সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য নব্য ব্যাকরণবিদরা এই দ্বন্দ্বের গভীরে গিয়ে ভাষার পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কথা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় দেখিয়েছেন, ভাষার প্রমিত রূপ নির্ধারণে ব্যাকরণ, উচ্চারণ, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের সর্বাধিক জনপ্রিয় মুদ্রিত সাহিত্যকর্ম ছিল ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' (Kamal 1977: 190)। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলা ভাষার কথ্যরূপ ও সাহিত্যের অভিজাত রূপের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলমান ছিল, যা আজও মান বাংলা প্রসঙ্গে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

পরবর্তী বাংলার সাহিত্যর তুলনায় এই সাহিত্য উৎকৃষ্ট না নিম্নমানের সে প্রসঙ্গ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এঁদের অনেকেই সমকালেই জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয়, বাংলা ভাষার পুনর্গঠনের ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টায় এই লেখকদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। গ্রন্থ মুদ্রণ ও পাঠের প্রসঙ্গও এখানে প্রাসঙ্গিক। ১৮১৬ সালে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মুদ্রণ জগতে এক নবযুগের সূচনা করেন (অনিন্দিতা ২০১১: ১০)। ওই একই বছরে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-ও মুদ্রিত হয় (Kamal 1977: 11)। এই গ্রন্থসমূহ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকেও 'বটতলার বই' নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি, বরং বেড়েছে; এবং শিক্ষিত অভিজাত সমাজও এসব গ্রন্থের আগ্রহী পাঠক ছিল (গৌতম ২০১১; অনিন্দিতা ২০১১)। এই বহুলপঠিত ভাষা সামগ্রিকভাবে পরবর্তী গদ্যসাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। তবে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত প্রভাবশালী ভাষাশৈলীতে এর স্থান হয়নি। 'ভাষার সংস্কৃতায়ন, কথ্যভাষার সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি করা এবং 'অশ্লীলতা'-র দোষযুক্ত যাবতীয় সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বর্জনের প্রবণতার মাধ্যমে উনিশ শতকের শিক্ষিত বঙ্গসমাজ তাদের

আদর্শ সাহিত্যরীতি গড়ে তোলে' (অনিন্দিতা ২০১১: ৪)। অন্তত 'বিদ্যাসাগরীয় গদ্য' পর্যন্ত এই প্রচলিত 'সাহিত্যিক' ভাষার কোনো স্পর্শ যে টিকে ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের সর্বাধিক জনপ্রিয় মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' (Kamal 1977: 190)।

১. কে বলে শরৎ চাঁদ সে মুখের তুলনা।
পদনখে পড়ি তার আছে কত গুণা।
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভ্রূভঙ্গে ভুলে।
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নের খেলায়।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ হরিণকে বুকে লয়ে। (বিদ্যার সৌন্দর্যবর্ণনা)
২. বিদ্যা করেছিল প্রতিজ্ঞা বিদ্যা করেছিল দৃঢ় সংকল্প।
সে পতিকে বিচার করবে যেই জন ॥
প্রতিজ্ঞায় জাতি কে চায় প্রতিজ্ঞায় জাতি কে চায়।
প্রতিশ্রুতিতে যে জয়ী হয় সেই নিয়ে যায়।
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ কাহিনি।
যেখানে যেখানে প্রতিজ্ঞা সেখানে সেখানে এই খেলা। (রাজার নিকট চোরের স্বীকারোক্তি)

প্রথম অংশে তৎসম শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। পুরনো বাংলা সাহিত্যের তৎসমবহুল রচনাশৈলীর সঙ্গে এর সংযোগ বিদ্যমান, যা আলাওল বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। তবে এই তৎসম শব্দগুলো একান্তভাবেই সংস্কৃত নয়, বরং বাংলা ভাষায় এখনও প্রচলিত। যৌগিক শব্দসমূহ দুটি পৃথক পদ নিয়ে গঠিত, যা আধুনিক বাংলা ভাষার গঠনবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সর্বোপরি, ক্রিয়াপদের স্বাভাবিকতা ও উচ্চারণশৈলীর স্পষ্ট রেখাপাত বাক্যের কাঠামোতে কবিত্বের উপস্থিতি বজায় রেখেও কোনো কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেনি।

দ্বিতীয় অংশ ভারতচন্দ্রের অনন্য বাকচাতুর্যের নিদর্শন। তবে সে প্রসঙ্গে না গিয়েও যদি শব্দতালিকা ও উচ্চারণপদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এর ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার খুব বেশি পার্থক্য নেই। গ্রন্থটির অসাধারণ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ যে এর ভাষার স্বাভাবিকতা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঔপনিবেশিক ভাষানীতি ও বাংলা গদ্যের রূপান্তর:

ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিল। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রমিত ভাষা নির্ধারিত হলেও, তা জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। সাহিত্যিক ভাষা এবং সাধারণ ভাষার মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকায়, বাংলা ভাষার বিবর্তন মূলত দুটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়—একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা এবং অপরটি লোকজ ভাষা। প্রিন্ট সংস্কৃতির প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে বাংলা মুদ্রণ জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন (অনিন্দিতা ২০১১: ১০)। একই সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতও মুদ্রিত হয় (Kamal 1977: 11)। এই গ্রন্থগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধেও তথাকথিত 'বটতলার বই' পাঠকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয় ছিল এবং শিক্ষিত অভিজাতগোষ্ঠীও এগুলোর প্রতি আগ্রহী ছিল (গৌতম ২০১১; অনিন্দিতা ২০১১)।

জনপ্রিয় এই ভাষাশৈলী নিঃসন্দেহে পরবর্তী গদ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার নির্মাণে এই ধারার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ 'ভাষার সংস্কৃতায়ন, কথ্যরূপ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং তথাকথিত 'অশ্লীল' সাহিত্য ও লোকধারাকে বর্জনের মাধ্যমে' তাঁদের আদর্শ সাহিত্যভাষার রূপ নির্মাণ করেছিল (অনিন্দিতা ২০১১: ৪)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার পরিবর্তনশীলতা ও ব্যবহারিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে, ভাষার প্রমিত রূপ শুধু ব্যাকরণ ও নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং সমাজ ও সময়ের সঙ্গে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি সাধু ও

চলিত ভাষার বিভাজনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং বাংলা গদ্যের সহজ, প্রাণবন্ত ও কথ্যরূপকেই গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা ভাষাচর্চার একটি সুসংগঠিত ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকে এঁদের 'নব্য ব্যাকরণবিদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঔপনিবেশিক পরিসরে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত ও ইংরেজির একচেটিয়া আধিপত্য গড়ে উঠেছিল, যার থেকে তাঁরা মুক্তি চেয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ফলে মান বাংলা সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষার সহজতা ও গদ্যশৈলী :

রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় দেখিয়েছেন, কীভাবে ভাষার গঠন প্রাকৃতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। তার মতে, সাধু গদ্য ছিল কৃত্রিম এবং তা জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের ভাষা সংস্কৃত-আশ্রিত হলেও, রবীন্দ্রনাথ এটিকে সরলীকরণের পক্ষে ছিলেন। আঠারো শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের সূচনায়, যদিও তথাকথিত মানসম্মত সাহিত্যকর্ম গড়ে ওঠেনি, তথাপি কবিওয়ালা, যাত্রাকার, কথাকার ও পাঁচালিকারেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষায় লেখালেখি করছিলেন। এঁদের ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে সুশীলকুমার দে লিখেছেন:

> "একদিকে কিছুটা সংস্কৃতঘেঁষা, অন্যদিকে কিছুটা ফারসি-প্রভাবিত, এই ভাষা স্বকীয় ভারসাম্য বজায় রেখেছিল এবং এর শক্তি ও প্রাণশক্তি ছিল দেশীয় মাটির গভীরে প্রোথিত। এটি যেমন সরলতায় স্বচ্ছ, তেমনই কথ্যভাষার সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় গৌরবান্বিত এবং এমন নিখুঁতভাবে স্বাভাবিক যে, এটি সর্বদা মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।" (De 1962: 258)

সাহিত্যিক গদ্যের চলনকে সাধু-চলিত দ্বন্দ্বের সরলীকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় এক ধরনের অস্পষ্টতা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রভাবের ফলে সাধু-চলিত তুলনামূলক পাঠের ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে সরলীকরণ ঘটেছে। তবে, যদি তাঁর ভাষা-বিষয়ক পর্যালোচনার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসলে এত সরল ছিল না। বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের জটিলতা সম্পর্কে অসচেতনতার ফলেই রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কয়েকটি উক্তি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, অথচ তাঁর সামগ্রিক অবস্থান হয়তো এতটা একরৈখিক ছিল না।

মোহিতলাল মজুমদার এবং সুশীলকুমার দে-র মতামতও এই বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ। মোহিতলাল লিখেছেন, "এই সাধু ভাষাই বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা। যদি এটি বাঙালি না খুঁজে পেত, তবে তার ভাষা আজও একেবারে গ্রাম্য রয়ে যেত। যদি এটি খাঁটি বাংলা না হয়ে সংস্কৃতের অনুসারী হয়, তবে বলতে হবে যে, জন্মগতভাবে বাঙালি এক জাতি হলেও চিন্তা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সে দ্বিজত্ব লাভ করেছে" (মোহিতলাল ২০০৫: ১২২)।

অন্যদিকে, সুশীলকুমার দে মনে করেন, "বাংলার প্রকৃত ভাষা সাধু বা চলিত কিছুই নয়; বরং তার সহজাত গতি ও ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক ফল" (সুশীল ১৯৫৪: ৩৬)। তাঁর মতে, "বাংলা ভাষার সব শক্তি ও সৌন্দর্য সংস্কৃত থেকেই এসেছে; সংস্কৃত ছাড়া বাংলা দুর্বল হয়ে যাবে" (সুশীল ১৯৫৪: ৩৯)। অন্যদিকে, নতুন বাংলা গদ্য প্রসঙ্গে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন: "যে ভাষাকে বাংলা বলে প্রচার করা হচ্ছে, তা পুঁথির ভাষা নয়, আবার সেটি প্রকৃত বাঙালির ভাষাও নয়" (সুশীল ১৯৫৪: ৩৫)।

এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, মোহিতলাল এবং সুশীলকুমার ভাষার প্রকৃতি ও বিকাশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন এবং তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্যের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভবিষ্যতে বাংলা গদ্যে এই পরিবর্তন ঘটবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তার প্রভাব:

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা পরবর্তী বাংলা গদ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তার ভাষাশৈলী বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে এবং বাংলা ভাষার গতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। ভাষার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ও সাহিত্যিক গদ্যের বিবর্তন:

শুধু আমদানিকৃত অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ কমানোই যথেষ্ট নয়; এতদিন ব্যবহৃত হয়নি এমন বহু শব্দকে আবার প্রচলনে আনতে হবে। কারণ, কথ্য ভাষার শব্দ যদি ব্যবহারের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা সাহিত্যিক ভাষার জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: "আমরা নিত্যদিন যে সমস্ত শব্দ ভদ্রসমাজে ব্যবহার করি, যা কোনোভাবেই নীচু স্তরের বলে গণ্য নয়, সেই শব্দগুলোকে যদি সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া হয়, তবে তার ক্ষতি একান্তভাবেই সাহিত্যিক" (প্রমথ ২০০৯: ২৬২)। 'কথার কথা' নিবন্ধে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মতবিরোধে প্রবৃত্ত হয়ে প্রমথ চৌধুরী সাধু গদ্যের অসুবিধাগুলো গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মনে করতেন, লেখায় যত বেশি সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করা হবে, ততই বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটবে। তবে, আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত (প্রমথ ২০০৯: ২৫৩)।

২) যে ভাষা আমরা সকলেই বুঝতে পারি, যার মাধ্যমে বহুদিন ধরে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব, সেটিই প্রকৃত বাংলা ভাষা। বাংলার অস্তিত্ব কোনো অভিধানের পৃষ্ঠায় নয়, বরং বাঙালির মুখের ভাষায় (প্রমথ ২০০৯: ২৫৪)।

৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা, বাংলা ভাষাকে যদি সংস্কৃতঘেঁষা করা যায়, তাহলে আসামি, হিন্দি ভাষাভাষীদের পক্ষে বাংলা শেখা সহজ হবে। তদুপরি, বাংলার বিশেষ সুবিধা এই যে, সংস্কৃত শব্দ যোগ করলেও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় না। অর্থাৎ, যাঁরা বাংলা জানেন না, তাঁদের বোঝার সুবিধার্থে সাধারণ বাঙালির জন্য সাহিত্যিক ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তুলতে হবে (প্রমথ ২০০৯: ২৫৬)।

৪) ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত কথ্য ও লেখার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা, বিভেদ সৃষ্টি করা নয়। ভাষা কলমের মাধ্যমে মুখে আসে, উল্টোটা হলে তা আর কার্যকর থাকে না। ইংরেজি ভাবনা, সংস্কৃত শব্দ এবং বাংলা ব্যাকরণ মিশিয়ে আমরা এক ধরনের খিচুড়ি ভাষা তৈরি করেছি, যা প্রকৃত বাংলা সাহিত্য নয়। ইংরেজি না জানলে ভাব বোঝা যায় না, সংস্কৃত না জানলে ভাষা বোঝা যায় না। এতে মনে হয়, বাংলা সাহিত্য যেন বিদেশি ভাবধারার ও পুরাতন ভাষার মাঝে বন্দি হয়ে আছে (প্রমথ ২০০৯: ২৫৭)।

প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি উনিশ শতকে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক গদ্যের ত্রুটি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনি সরাসরি বিষয়টি উল্লেখ করেননি, তবে ঔপনিবেশিক প্রভাবে গঠিত বাংলা গদ্যের প্রকৃতি মনে রেখেই সমালোচনা করেছেন। এ কারণে, তাঁর দৃষ্টিতে ইংরেজি ভাবধারার আধিক্য এবং সংস্কৃতনির্ভর ভাষা প্রায় সমানভাবে সমস্যাসঙ্কুল ছিল। তিনি সাহিত্যিক ভাষার আদর্শ কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর পক্ষে ছিলেন না; বরং জীবন্ত ভাষার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। লক্ষণীয়, তিনি চলিতরীতির বিশেষ কোনো ধরনকে অগ্রাধিকার দেননি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল রয়েছে। বাংলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমেই আমরা সে শক্তি ও দক্ষতা অর্জন করব, যা আমাদের সাহিত্যকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাবে" (প্রমথ ২০০৯: ১৩৮)। অর্থাৎ, অন্য ভাষা নির্ভর করা এবং অন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রমিত বাংলার বর্তমান সংকট:বহুভাষিক বাস্তবতা ও প্রমিত বাংলার পরিবর্তন:

আধুনিক বিশ্বে ভাষার সংমিশ্রণ ও বহুভাষিক বাস্তবতা প্রমিত বাংলার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। ইংরেজি ও হিন্দির মতো ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণ ও ব্যাকরণে পরিবর্তন আনছে।

প্রমিত বা মানক বাংলা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। আধুনিক কালে এ বিষয়ে বিতর্কের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা ভাষাচর্চার ভৌগোলিক বাস্তবতা, যেখানে ভাষার দুটি কেন্দ্র—কলকাতা ও ঢাকা—দুই ভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত। ফলে অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলার ভাষিক অবস্থান বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও জটিল। ভাষার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও পুরনো প্রমিত রূপের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চ্যালেঞ্জও এই জটিলতা বাড়িয়েছে। তদুপরি, বর্তমান বিশ্বে বহুভাষিক বাস্তবতা, যেখানে ইংরেজি ও হিন্দির মতো আন্তর্জাতিক ভাষার প্রভাব এবং নিজস্ব বিভিন্ন উপভাষার প্রসার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এসব বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ ভাষিক

প্রভাবের সাথে প্রমিত বাংলা কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবে, তা নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

নতুন গদ্যের জন্য সমকালীন গদ্যসাহিত্য বাদ দিয়ে পুরোনো কাব্যের ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। নতুন গদ্যের সংস্কৃত-আধিক্যের সাপেক্ষে সাধারণত পুরোনো কাব্যের সংস্কৃতায়িত ভাষার উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। এই দুটি তাত্ত্বিকভাবে সঠিক হলেও বাস্তবে কৃত্রিম উচ্চারণরীতির যে নতুন গদ্য উৎকৃষ্ট গদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে পুরোনো কবিতারও কোনো প্রতিফলন ছিল না। এ বিষয়ে গ্রিয়ারসনের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক:

> "তাঁদের ভাষা (চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র) বর্তমান শতাব্দীর পণ্ডিত-নির্ভর ভাষার বিপরীত। তাঁরা লিখেছেন প্রকৃত, সজীব বাংলা ভাষায়, এবং তাঁদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে, আধুনিক লেখকদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে বাংলা ভাষা শুধু বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সাহায্য ছাড়া উচ্চস্তরের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।" (Grierson 1903: 16)

এ লেখায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে, মান বাংলার সংকট মূলত ঔপনিবেশিক পরিসরে বাংলা ভাষার সংকটেরই প্রতিফলন। একপর্যায়ে এই আলোচনা সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত চলিত রীতিই প্রমিত রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এই পরিবর্তনকালে অনেক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক আড়াল থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক আলোচনা এই সংকটকে গভীরভাবে চিহ্নিত করেছে, কারণ তিনি ভাষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি ব্যবহারিক বাস্তবতাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষার প্রমিত রূপ গঠনের সাথে ব্যাকরণ রচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উচ্চারণবিধি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই লেখায় যুক্তি প্রদান করা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক বিশ্লেষণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্য তুলনামূলকভাবে উন্নত কি না, তা এখানে গৌণ বিষয়। অনেকেই তখনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয়, ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলা ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অংশ হিসেবে এই লেখকদের কখনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

পুরোনো কবিতা ব্যতীত গদ্য ও পদ্য আকারে উনিশ শতকের সর্বত্র রচনা ও পাঠের প্রচলন অব্যাহত ছিল। বটতলার বিপুল পরিমাণ প্রকাশনাই তার অন্যতম নিদর্শন। এখানে ভাষার যেমন একপ্রকার ঐক্য বজায় ছিল, তেমনি জনসংস্কৃতিতেও ছিল ধারাবাহিকতা। যেমন, যাকে পরবর্তী সময়ে 'দোভাষী পুথি' বা 'মুসলমানি বাংলা' বলা হয়েছে, তা উনিশ শতকজুড়েই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও পাঠযোগ্য ছিল। 'গোল-ই-বকাওলি', 'ইছফ জোলেখা', 'লায়লি মজনু', 'সাহানামা' প্রভৃতি জনপ্রিয় গ্রন্থের অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে হিন্দু সমাজের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য ছিল (গৌতম ২০১১: ২২৫-৩০; সুমন্ত ২০১১: ১১৮)।

সর্বোপরি, কবিগান, পাঁচালি, যাত্রাপালা থেকে শুরু করে মুসলমানি পুথি পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অভিজাত সমাজের সংস্কৃতপনা ও ইংরেজি-অনুরাগের বাইরে একটি শক্তিশালী লোকসংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, যেখানে ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অধিকতর পরিলক্ষিত হয়, বিরোধিতার চেয়ে ঐক্যই বেশি প্রকট ছিল। এ ধারা অভিজাত গৃহেও বহুবার প্রবেশ করেছে। কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন সংস্কৃতি বা নতুন গদ্যরূপ থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভাষা সমাজের রীতি মেনেই বিকশিত হয়েছে।

নতুন সাহিত্যিক গদ্যকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (2002:134) 'দ্বিগুণ কৃত্রিম ভাষা' (doubly artificial language) বলে অভিহিত করেছেন। এই সৃষ্ট গদ্যের প্রধান সংকট ছিল, নতুন শিক্ষাধারায় অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে তা পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়া। এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অংশের কাছেও এই গদ্য বিশেষভাবে উপভোগ্য ছিল না, যার প্রমাণ রাজনারায়ণ বসুর পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় (রাজনারায়ণ ১৪০২: ৩১৪)। এর কারণ, কেবলমাত্র সাধারণ জনগণের ভাষা নয়, এই গদ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষা থেকেও পৃথক ছিল।

উপভাষার প্রসার ও প্রমিত রূপের চ্যালেঞ্জ:

বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ক্রমাগত প্রসার লাভ করছে, যা প্রমিত বাংলার সংজ্ঞাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলছে। আঞ্চলিক ভাষার জনপ্রিয়তা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও প্রমিত বাংলার স্বীকৃত কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলছে।

সর্বজনীন ভাষার ধারণা ও মান ভাষার প্রস্তাবনা:

'মান ভাষা' বা 'প্রমিত ভাষা' শব্দবন্ধ রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করেননি, তবে তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি বাংলা ভাষার একটি সর্বজনীন রূপ গঠনের পক্ষে ছিলেন। এই ধারণার প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯০)। পবিত্র সরকারের মতে, এটি ছিল "সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলতি বাংলাকে গ্রহণ করার প্রথম সুস্পষ্ট প্রস্তাব" (পবিত্র ১৯৯৯: ১০)। শ্যামাচরণ মূলত শিক্ষিত বাঙালির মুখের ভাষাকে লেখার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা টেনে এনে দেখান যে, সেখানকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষার কাছাকাছি থাকে (Ganguli 1990: 25)।

শ্যামাচরণ কেবল কলকাতার ভদ্র সমাজের ভাষাকে নয়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষাকেও বিবেচনায় এনেছিলেন (Ganguli 1990: 27)। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় মুখের ভাষার ব্যবহার করলে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সর্বোত্তম উপকার হবে। তাঁর মতে, সর্বজনীন বোধগম্যতা অর্জন করাই ভাষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উপসংহার:

বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নির্ধারণ এক বহুমাত্রিক এবং বিতর্কিত বিষয়। ঔপনিবেশিক প্রভাব, সমাজের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন, ভাষার পরিবর্তনশীলতা এবং বহুভাষিক বাস্তবতা এই সংকটকে গভীরতর করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার সহজতা ও ব্যবহারিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা বাংলা গদ্যের চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল। আধুনিক সময়ে বহুভাষিক চ্যালেঞ্জ ও প্রযুক্তির প্রভাব বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপের সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে তা পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষারূপকে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ্রন্থপঞ্জী:

বাংলা উৎসসমূহ :

১. ঘোষ, অনিন্দিতা, বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস বটতলা বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদনা: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা।

২. ভদ্র, গৌতম, ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার? ছাতিম বুস, ২০১১, কলকাতা।

৩. সরকার, পবিত্র. ভাষামনন: বাঙালি মনীষা ২য় সংস্করণ, পুনশ্চ, ১৯৯৯, কলকাতা।

৪. চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ ৩য় মুদ্রণ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০০৯, ঢাকা।

৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী সম্পাদনা প্রফুল্লকুমার পাত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৮৯, কলকাতা।

৬. মজুমদার, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ ভবন, ২০০৫, কলকাতা।

৭. নাথ, মৃণাল, বাঙালীর ভাষাচিন্তায় চলিত-সাধুর দ্বন্দ্ব, বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা, সম্পাদনা: মনসুর মুসা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪, ঢাকা।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, (আঠার খণ্ড) ৩য় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ২০০৬, ঢাকা।

৯. বাংলা শব্দতত্ত্ব তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২, কলকাতা।

১০. বসু, রাজনারায়ণ, সে কাল আর এ কাল নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৪০২, কলকাতা।

১১. বসু, রাজশেখর, সাধু ও চলিত ভাষা, বাঙলা ভাষা, সম্পাদনা: হুমায়ুন আজাদ, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা।

১২. দাশ, শিশিরকুমার, মোদের গরব মোদের আশা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯, কলকাতা।

১৩. সেন, সুকুমার , ভাষার ইতিবৃত্ত ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, কলকাতা।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, বটতলার 'দোভাষী' সাহিত্য সেকাল ও একাল , বটতলা বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদনা: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা।

১৫. দে, সুশীলকুমার, নানা নিবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৪, কলকাতা।
১৬. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, রচনা-সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯, কলকাতা।
১৭. রচনা-সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।
১৮. দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, আকাদেমি পত্রিকা, ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৮৮, কলকাতা।
১৯. আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাদক বাঙলা ভাষা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ২০০২, ঢাকা।

ইংরেজি উৎসসমূহ:

1. Anderson, Benedict, Imagined Communities, Verso, 1983, London.
2. Bhattacharya, Pradyumna, Rammohun Roy and Bengali Prose, Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, edited by V. C. Joshi, Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1975, Delhi.
3. Chatterji, Suniti Kumar, The Origin and Development of the Bengali Language, 3rd impression, Rupa & Co, 2002, New Delhi.
4. De, Sushil Kumar, Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857), 2nd edition, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962, Calcutta.
5. Ganguli, Syamacharan, Bengali Spoken and Written, Akademi Potrika, vol. 3, Poshcimbongo Bangla Akademi, 1990, Calcutta.
6. Grierson, G. A., editor, Linguistic Survey of India, Vol. V, Indo-Aryan Family, Eastern Group, Part I, Motilal Banarsidass, 1903, Delhi, Varanasi, Patna.
7. Grierson, Sir George, The Indian Empire, 1912, Calcutta.
8. Hussain, A. T. M. Azfar, The Point is to (ex) change it: Toward a Political Economy of Land, Labour, Language, and the Body.' PhD dissertation, Washington State University, Department of English, 2003, Manuscript microfilmed by UMI.
9. Kamal, Abu Hena Mustafa, The Bengali Press and Literary Writing, University Press Limited, 1977, Dhaka.
10. Philipson, Robert., Linguistic Imperialism, 6th impression, Oxford University Press, 2003.
11. Qayyum, Muhammad Abdul, A Critical Study of the Early Bengali Grammar, The Asiatic Society of Bangladesh, 1982, Dhaka.
12. Walder, Dennis, Post-Colonial Literature in English: History, Language, Theory, Blackwell Publisher, 1998.